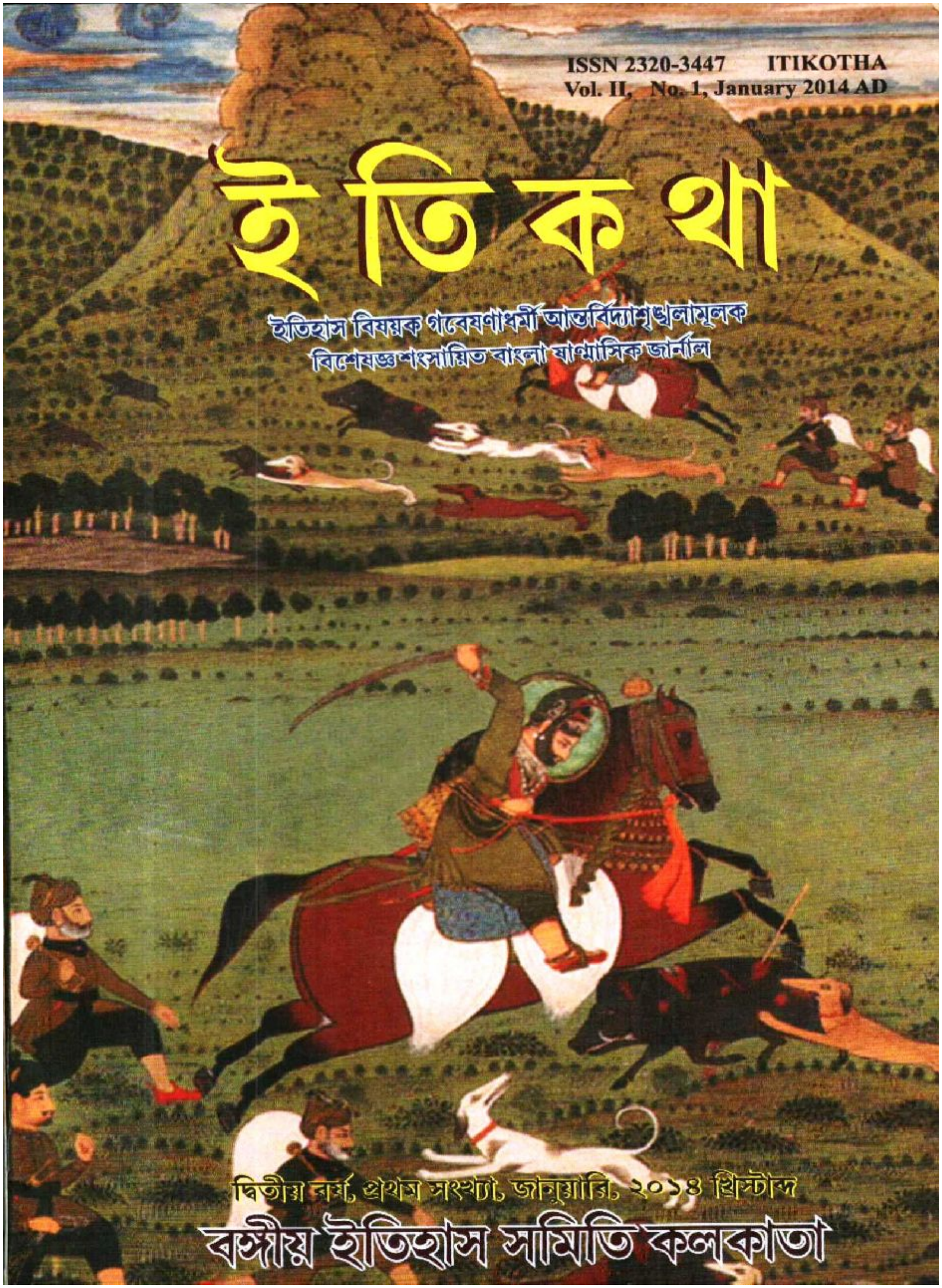

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. II, No. 1, January 2014 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞশংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)

প্রোফেসর নির্বাণ বসু

প্রোফেসর সনৎকুমার নস্কর

ড. সুচন্দ্রা ঘোষ

প্রোফেসর অমিত দে

ই তি ক থা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 Itikotha (Print)
Vol. II, No. 1, January 2014 AD

সম্পাদকীয় ৯

প্রয়াণলেখ

আমার স্মৃতিতে অধ্যাপক অমলেন্দু দে ১১
গৌতম নিয়োগী

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ ১৬
এ. এফ. সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ

প্রবন্ধ

ধর্ম, সমাজ ও বিনোদন : প্রসঙ্গ নাট্যশাস্ত্র ২৪
মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা : অগ্নিপুরাণ ৩৪
অমৃতা চক্রবর্তী

প্রাক্-মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বৃত্তি-পরিচিতি ৪৯
লিলি হালদার

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতির রূপরেখা : একটি বিতর্ক ৭১
বিনয়ভূষণ চৌধুরী

প্রবন্ধ

বাংলার মতুয়া আন্দোলন : নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার ও আত্মজাগরণ ৯২
মনোশান্ত বিশ্বাস

ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোক-চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ১১৯
শ্রাবণী ঘোষ

'জুলাই'-এর আলোকমালা ঃ ফ্রান্স ১৮৩০ ১৩৯
সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও স্মৃতিকথায় সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুবন্ধ ১৫৭
দেবব্রত ঘোষ

কয়েকটি রাজকীয় পরিবার ও ক্রিকেট ১৬৯
সুমিত গাঙ্গুলী

বর্ধমান জেলায় নারী আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা (১৯৪২-৫২) ১৮৭
কাকলি মুখার্জী

প্রান্তিকের প্রান্তিক : আদিবাসী নারী ও প্রচলিত অধিকথন (মিথ) ২০১
দেবশ্রী দে

গ্রন্থ সমালোচনা

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস ২২১
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

আমজনতার জন্য বাংলার রাজনীতির ইতিহাস ২২৯
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

আমার স্মৃতিতে অধ্যাপক অমলেন্দু দে

গৌতম নিয়োগী*

(প্রাপ্ত : ১৮ মে ২০১৪ খ্রি.)

সেই দিনটি ছিল আমার কাছে খুব আনন্দের। সদ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি পেয়েছেন আমার অন্যতম প্রিয় এবং পূজনীয় শিক্ষক অধ্যাপক অমলেন্দু দে। সময়টা ১৯৭৭। তখনও তিনি পিএইচ.ডি করেননি, সরাসরি ডি.লিট. এটি ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল, গবেষণা-পত্র *খাকসার মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া* জমা দিলেন এবং সাফল্যের মুকুট পরলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন চারজন : নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, শিবপদ সেন, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং জগদীশনারায়ণ সরকার। যে দিনটির কথা বলছিলাম, সেটি তাঁর ডি.লিট. প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানানোর অনুষ্ঠান। সেদিন আমরা তাঁর সহকর্মী, বন্ধু, অনুরাগী এবং ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হয়েছিলাম দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের কাছে মুরলীধর গার্লস কলেজের একটি ঘরে। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন, অমলেন্দুদার নিকট আত্মীয় এবং বইয়ের প্রকাশক ক্ষিতীশচন্দ্র দে, তিনিও আজ ইহলোকে নেই। সভায় সভাপতিত্ব করলেন আমার আর এক শিক্ষক ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আর বক্তা ছিলেন ড. গুপ্ত ছাড়াও জগদীশনারায়ণ সরকার, শশিভূষণ চৌধুরী, সুনীলকুমার সেন প্রমুখ। খুব আনন্দের আর তৃপ্তিদায়ক সেই স্মৃতি এখনো মনে গাঁথা আছে।

বিশিষ্ট ইতিহাসাচার্য অমলেন্দু দে ছিলেন আমার একান্ত নিকটজন, শুধু শিক্ষক নন, প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে, তখন তিনি থাকতেন ঢাকুরিয়ার সেলিমপুর লেনে। আমি তখনও যাদবপুরে ভর্তি হইনি। পঞ্চাশ বছরে পরিচয়। তাঁর কাছে পাঁচ বছর পাঠ নিয়েছি। আমৃত্যু সেই শ্রদ্ধা-প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন অটুট ছিল। তাঁর সঙ্গে এতটাই নিকট সম্পর্ক উত্তরকালে হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁকে অমলেন্দুদা সম্বোধনে ডাকতাম। যখন ধূমপান করতাম, তাঁর সামনে লুকিয়েছি বলে মনে পড়ে না; তাঁর স্ত্রী নাসিমাদি আমার একমাত্র ছোট বোনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী; তাঁর পুত্র-কন্যা, বাবুয়া (অমিত) এবং মুনিয়া (তাপ্তী) আমার স্নেহের। প্রায় জন্মাবধি ওদের দেখেছি।

* প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, হুগলী।
e-mail : goutamneogi1947@gmail.com

বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ

এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ*

(প্রাপ্ত : ১৫ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি.)

বাংলাদেশের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ নব্বই বছর অতিক্রম করলেন। কিন্তু বয়সের ভার তাঁর চিন্তার জগতকে ভারাক্রান্ত করতে পারে নি। এ বছর বাংলাদেশের ঢাকা বাংলা একাডেমিতে তিনি **অমর একুশে** বক্তৃতা দান করেন যে বিষয়টির উপর, তার গুরুত্ব পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বাঙালিদের কাছেও কিছু কম নয়। তাই এটি আমরা আমাদের এক অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য করেছি। ক্ষুদ্রাকার এই প্রবন্ধটি ঢাকা বাংলা একাডেমির সৌজন্যে ও অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তীর তৎপরতায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় গত এপ্রিল মাসে। আমরা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করছি এই মুদ্রণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

সম্পাদকমণ্ডলী

বাঙালি সংস্কৃতিকে সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি বলা যায়। বহুবিধ এবং বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ের ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক বঙ্গভূমি বা বাংলাদেশে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ও স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ) সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। এই সকল নরগোষ্ঠী সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের নিজস্ব বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপাদান। এসব বহিরাগত উপাদান বা উপকরণের সঙ্গে দেশজ উপাদানের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় হয়েছে এবং এর ফলেই বাংলার সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটেছে যুগে যুগে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে এমন কতকগুলো দিক আছে, যেগুলো আমাদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাঙালি চিরদিন ভাবপ্রবণ জাতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে'[১]। বাঙালির ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। বাংলার মানুষের মনকে ধর্মের—তা যে কোনো ধর্ম হোক না কেন, তার বাহ্যিক আচার-বিচারের চেয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী

*জাতীয় অধ্যাপক, বাংলাদেশ।
e-mail : afsahmed24@gmail.com

প্রবন্ধ

ধর্ম, সমাজ ও বিনোদন : প্রসঙ্গ নাট্যশাস্ত্র

মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত : ২৪ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.; মানোনীত : ১৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

নাট্যশাস্ত্র, ভারতের নাটকের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ যা নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গে প্রথমবারের জন্য বক্তব্য রাখে। বিতর্ক থাকলেও এটা ধরে নেওয়া যায় যে ভারতের ইতিহাসে প্রথম নাটককার হলেন ভাস, তারপরেই যার কথা মনে আসে তিনি হলেন কালিদাস— যাঁদের নাটক সমাদৃত হয়েছিল জনমানসে। লেখবিদ রিচার্ড সালোমন যখন লেখমালার প্রকৃতিগত বিভাজন করেন তখন তিনি লিটারারি ইনস্ক্রিপসন বা সাহিত্যিক উপাদানকেন্দ্রিক লেখমালার কথা বলেন একটি বিশেষ ধরনের লেখমালা হিসাবে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে তিনি এমন কিছু লেখমালার কথা বলেন যেগুলির উপাদান নাটক। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে লেখমালায় নাটকও জায়গা করে নিয়েছিল। অর্থাৎ নাটকের একটা জনপ্রিয়তা ছিল প্রাচীন ভারতে, না হলে প্রাচীন ভারতের অন্যতম গণজ্ঞাপন-মাধ্যম লেখমালায়, উপাদান হিসাবে নাটক হয়তো জায়গা পেত না। কালিদাসও যখন নাটক লিখছেন তখন তিনি সমকালীন অন্য নাটককারদের থেকে নিজের নাটকের অনন্যতার কথা তাঁর দর্শক/পাঠক-কে মনে করিয়ে দিয়েছেন, যা সেকালের নাটককারদের মধ্যে যে ভাল নাটক লেখার প্রতিযোগিতা ছিল তা মনে করিয়ে দেয়। প্রশ্ন হল নাটকের এই জনপ্রিয়তা কি শুধুমাত্র নাটককারের লেখনীর গুণেরই ফল ছিল? এখানেই উঠে আসে নাট্যাভিনয়ের সামাজিকীকরণের বিষয়টি, যা নাটক-কে সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। আর এই সামাজিকীকরণের সাথেই প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন আচার- অনুষ্ঠান যার সংযুক্তির সাথে অভিনয়ের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য যোগ পাওয়া যায় না। এই সংযুক্তির কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে প্রাচীন ভারতে কীভাবে ধর্ম, সমাজ ও বিনোদন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, সেই ইতিহাসকে— যা মূল নিবন্ধের আলোচনার বিষয়।

সূচকশব্দ

নাট্যশাস্ত্র, নাট্যবেদ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্যবাদ।

*পি-এইচ. ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ণ সময়ের প্রভাষক, স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগ, ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার।
e-mail : mr.malyaban@gmail.com

প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতে রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা : অগ্নিপুরাণ

অমৃতা চক্রবর্তী*

(প্রাপ্ত : ১১ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রি.; সংশোধিত : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অন্যতম *অগ্নিপুরাণ* একটি *বিশ্বকোষসম* গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে যুক্তিবাদের আলোকে মানুষের রোগ-ব্যাধি, রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের নানা উপায় বর্ণিত হয়েছে। নীরোগ জীবনযাপনের জন্য দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দিন কাটানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত রাখার জন্য বৃক্ষ ও পশুদের পরিচর্যা, তাদের রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যাধির চিকিৎসায় আয়ুর্বেদের জটিল পদ্ধতিসমূহকে বর্জন করে মূলত ভেষজ ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পরম্পরাগত দেশজ চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস দেখা যায়।

সূচকশব্দ

প্রাচীন ভারত, রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসা, ঔষধ, অগ্নিপুরাণ।

জ্ঞানের অধিকর্তা মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই রোগমুক্ত শরীর ও দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য মানুষ অবিরত প্রয়াস করে চলেছে। পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সমাজ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসাপদ্ধতি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের বিবর্তন ঘটে চলেছে। ভারতের মনীষার বহু শতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞানমনস্ক অনুসন্ধিৎসার

*গবেষিকা, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : achakraborty92@gmail.com

প্রবন্ধ

প্রাক্‌-মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বৃত্তি-পরিচিতি

লিলি হালদার*

(প্রাপ্ত : ১২ জুলাই ২০১৩ খ্রি.; মান্যোনীত : ৭ আগস্ট ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষে আর্য জনগোষ্ঠীর প্রবেশের পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে প্রাগার্য-জনগণ বসবাস করত। আর্য জনগোষ্ঠী প্রথমে উত্তর ও মধ্যভারতে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে পূর্বভারতে প্রবেশ করে। আর্য-প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সমন্বয় হতে বহু বছর সময় লেগেছিল। আর্যরা অসংখ্য কৌম বা জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রাগার্য জনগণ সম্বন্ধে উন্নাসিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। বঙ্গদেশে বিভিন্ন শাসকবর্গের রাজত্বকালে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্র ধরেই আর্য অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বঙ্গদেশ আর্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়— যার সাক্ষ্য দেয় বিভিন্ন স্মৃতি-পুরাণগ্রন্থ। বঙ্গদেশ আর্যজনগণ দ্বারা অধ্যুষিত হলে তাদের আর্যব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা, সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করে। এর থেকেই আর্যবর্ণব্যবহার চাতুবর্ণ প্রথা বাংলার সমাজের অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত হয়ে যায়। বিভিন্ন পুরাণকথার সাক্ষ্যে জানা যায় বঙ্গদেশে প্রচলিত ব্রাহ্মণ ছাড়া মোট একচল্লিশটি জাতি-নাম এবং তাদের বৃত্তি-পরিচিতি। পুরাণ ও বিবিধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় কীভাবে বর্ণ অনুযায়ী সমাজে বৃত্তি নির্ধারিত হল। সমাজে বর্ণনির্দিষ্ট এই যে বৃত্তিপ্রথা এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় তৎকালে প্রচলিত সাহিত্যকর্ম থেকেও। প্রাক্‌-মধ্যযুগের সাহিত্য চর্যাগান এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য থেকে নানা বৃত্তি-পরিচিতি, জাতি-ধর্মের মানুষের উল্লেখ মেলে। বর্তমান প্রবন্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস ও বর্ণভেদে নির্দিষ্ট বৃত্তি, যা সমাজে প্রচলিত ছিল, তা সাহিত্যিক নিদর্শনের সাপেক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

সূচকশব্দ

আর্যপ্রবেশ, আর্যীকরণ, পদবী-পরিচয় অপ্রচলিত, শূদ্র সংকর উপবর্ণ, পতিত ব্রাহ্মণ, বৃত্তি শাস্ত্র নির্ধারিত, পঞ্চগৌড়, রাঢ় ও বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা, বর্ণবিন্যাস

*এম. ফিল. গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতিথি প্রভাষক, শিরাকোল মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
e-mail : bisk707@gmail.com

অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতির রূপরেখা : একটি বিতর্ক

বিনয়ভূষণ চৌধুরী*

দ্বিতীয় ভাগ

(৩,খ)

মুঘল রাজশক্তির অবক্ষয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি—এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এর সঙ্গে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের অভাব বা অর্থ ব্যবস্থায় 'স্বশাসন' তত্ত্বের কোনও যোগ ছিল না।

আমরা এর আগে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্তির অবতারণা করেছি তার মূল প্রবক্তা হলেন বেইলি। তাঁর মতে আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান শুধুমাত্র অর্থব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এনেছিল শুধু নয়, তার বিস্তারও ঘটিয়েছিল। তাছাড়া এর ফলে সম্পদের পুনর্বন্টন (redistribution of resources) এবং সম্পদের হস্তান্তরও (transfer of resources) সম্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকের সর্বব্যাপী দুর্গতি সম্পর্কে প্রচলিত জনমত 'Black Legend'-কে বর্জন করলেও সে যুগের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্থায়িত্বের অভাব যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—তা তিনি স্বীকার করেন। তবে তাঁর মতে এ বিপর্যয় সর্বব্যাপী নয়। বাস্তবে যা ঘটেছিল তা হল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এক ধরনের পরিব্যাপ্তি অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সর্বত্র লুপ্ত হল না বরং ছড়িয়ে পড়ল এমন সব অঞ্চলে যেখানে সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার নিরাপত্তা স্থায়ী করার প্রচেষ্টা এ সময় থেকেই শুরু হয়। এর ফলে দেখা যায় কিছু আঞ্চলিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লেও, তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু অঞ্চল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মুঘল শাসনমুক্ত অঞ্চলেই (successor states) এ সমৃদ্ধি চোখে পড়ে।

বেইলির যুক্তি হল[৩৬] : অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এক নূতন অভিমত তুলে ধরা যায়। সেটি হল সে যুগের রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে যে সব পরাক্রমশালী আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব হয় তারাই মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার

*প্রফেসর (অব.) ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সাধারণ সভাপতি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস।
e-mail : bbchaudhuri@gmail.com
অনুবাদ : সৌমিত্র শ্রীমানী ও তৃপ্তি চৌধুরী।

প্রবন্ধ

বাংলার মতুয়া আন্দোলন : নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার ও আত্মজাগরণ

মনোশান্ত বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত : ২৪ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রি.; মানোন্নীত : ১৬ মে, ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বাঙালি হিন্দু সমাজে তথাকথিত 'চণ্ডাল' বা নমঃশূদ্ররা সংখ্যার বিচারে বৃহৎ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক সমাজের কাছে 'অ-জল-চল' ও 'অস্পৃশ্য' বলে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হত, আবার উচ্চবর্ণীয় প্রভাবশালী জমিদার ও জোতদারদের দ্বারা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত হত। মধ্যযুগে বৈষ্ণব আন্দোলন নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণকে আংশিক সামাজিক মর্যাদা দিলেও চৈতন্যোত্তর উচ্চবর্ণের বৈষ্ণব গুরুরা নিম্নবর্ণের মানুষকে সঠিক মর্যাদা দান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিশা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। আবার ঊনবিংশ শতকের বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের আলোক-শিখা গ্রাম বাংলার নিম্নবর্গীয় সমাজে আদৌ প্রবেশ করেনি। এই অবস্থায় ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামের নমঃশূদ্র সন্তান হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) 'মতুয়া ধর্ম' প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আদর্শকে তুলে ধরেন। হরিচাঁদের পরে তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) মতুয়া আন্দোলনকে নিছক ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করে এক শক্তিশালী সমাজ- সংস্কার ও ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা আত্মজাগরণ ও আত্মমর্যাদার আদর্শকে মতুয়াদের সামনে উপস্থাপন করেন। হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র সমাজের কৌম ধর্মীয় আদর্শ ও ভক্তিবাদের আশ্রয়ে স্বতন্ত্র ভক্তিবাদী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। মূলত গুরুচাঁদ ঠাকুরের বহুমুখী কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে মতুয়া তথা নমঃশূদ্র সম্প্রদায় একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতিহিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সার্বিক ভাবে মতুয়া আন্দোলন নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্রদের একটি ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলন রূপে ভূমিষ্ঠ হলেও স্থানীয় সংকীর্ণতা (Local Narrative) অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোত ধারায় (Grand Narrative) নিজেদের আত্মস্থ করে নিয়েছে।

সূচকশব্দ

চণ্ডাল, অ-জল-চল, অন্ত্যজ, আত্মমর্যাদা, গার্হস্থ্যধর্ম, নামসংকীর্তন, প্রেম-ভক্তির তত্ত্ব, জাত-বৈষ্ণব, হাতে কাম মুখে নাম, দ্বাদশ আজ্ঞা, অন্নব্রহ্ম, শিক্ষাবিস্তার, ব্রাহ্মণ্যবাদহীন মূল্যবোধ, জাগরণী সভা, নমঃশূদ্র কল্যাণ সমিতি, মতুয়া মহাসংঘ।

*এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া।
e-mail : manosantabiswas@gmail.com

ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোক-চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি

শ্রাবণী ঘোষ*

(প্রাপ্ত : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রি.; মানোন্নীত : ১৪ মার্চ ২০১৪ খ্রি.)

সংক্ষিপ্তসার

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জনবিন্যাসের বৈচিত্র্য উত্তরবঙ্গকে বাংলার অপর প্রান্ত থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, সংস্কৃতি এবং ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে এই উত্তরবঙ্গে। তারা প্রধানত নিজেদের বাসস্থান স্থাপন করেছেন প্রকৃতির সন্নিকটে পাহাড়ে, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বনজঙ্গলে, চা-বাগান সংলগ্ন এলাকায় এবং সমভূমির কিছু অঞ্চলেও। এই নানাবিধ জাতি এবং উপজাতিগুলির মধ্যে *রাজবংশী, রাভা, মেচ, টোটো, ধীমাল, মালপাহাড়ী, ওঁরাও, সাঁওতাল, গারো, তামাং, লেপচা, লিম্বু* প্রমুখ জনগোষ্ঠীর মানুষের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান অনুসর্গের আলোচনার বিষয়বস্তু। কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি আবার অনেক উপজাতির জন্মহার অপ্রতুল যা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে হানিকর। সুতরাং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা আছে। বর্তমান যুগে নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব হচ্ছে। এই সব রোগের প্রতিকারের জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থা অনেকাংশে বিফল হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে আদিবাসী চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আমরা ফিরে তাকাতে পারি। বর্তমান কালে বনজঙ্গল কেটে ফেলার ফলে ভেষজ উদ্ভিগুলিও অবলুপ্তির পথে। এই ভেষজ উদ্ভিদ উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শিকার যেহেতু আইনত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার ফলে আদিবাসী চিকিৎসকরা বিভিন্ন রোগের ওষুধ প্রস্তুত করবার জন্য নানাবিধ প্রাণীজ উপাদান আহরণ করতে পারছেন না। এই সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আদিবাসী চিকিৎসাব্যবস্থার গুরুত্ব আজও অস্বীকার করা যায় না।

সূচকশব্দ

লোক-পুরাণ, জাতি, উপজাতি, রোগ, ওষুধ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ওঝা, পূজা, মন্ত্র, দেবদেবী, জাদু।

*অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আলিপুরদুয়ার কলেজ, আলিপুরদুয়ার।
e-mail : srabanighoshrudra@gmail.com

'জুলাই'-এর আলোকমালা : ফ্রান্স ১৮৩০

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী*

(প্রাপ্ত : ২২ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মিশেল লিখেছিলেন যে ১৮৩০-এর বিপ্লব 'জুলাই এর আলোকমালা' *বুঁর্বঁদের* প্রত্যাবর্তন বেশিদিন টেঁকেনি। লুই চেষ্টা করেছিলেন দুই ফ্রান্সের মধ্যে সমঝোতা করার, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। দশম চার্লস পুরনো রাজত্ব, চার্চের প্রাধান্য ও অভিজাতদের সমস্ত পুরনো বিশেষ সুবিধা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমতাবস্থায় সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য ছিল। বিপ্লব ও নেপোলিয়নের পর্বে ফ্রান্সে যে পরিবর্তন হয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বা পাল্টে দেওয়া আর সম্ভব ছিল না। ১৮১৫র পরেও রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন *বুঁরবন* শাসকদের পক্ষে যায়নি। সনদকে ঘিরে যে রাজনৈতিক বৃত্তগুলি তৈরি হয়েছিল তারাও সক্রিয় ছিল। নতুন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র জনমত সংগঠনে সাহায্য করেছিল। প্যারিসের সঙ্গে প্রদেশগুলির বেশ তফাত ছিল। ১৮২০-র দশকের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। চার্লস ও তাঁর মন্ত্রীরা যখন অর্ডিন্যান্স জারি করে নির্বাচন তথা জনমতকে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন প্যারিসের বিদ্রোহ ১৭৮৯-এর স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। জনগণের ব্যারিকেড ও উদারপন্থীদের মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ মিলে গেল। বিপ্লব কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নি। *অর্লিয়ানস* বংশের লুই ফিলিপ নতুন রাজা হলেন। ফ্রান্সের বিপ্লবের সন্ধান আবার দোটানার মধ্যে; নতুন নির্বাচিত রাজতন্ত্রের বৈধতা উদারপন্থী বিপ্লবের মধ্যেই খোঁজা হয়েছিল। কিন্তু প্যারিসের জনগণের বিপ্লব মধ্যশ্রেণি আবার আত্মসাৎ করল। ১৮৩০-এর বিপ্লবের সেই বহুমুখী তাৎপর্য এখানে আলোচনার বিষয়।

সূচকশব্দ

বিপ্লব, জাকোবিন, লে ত্রোয়া গ্লোরিয়ুজ, উদারপন্থা, ব্যারিকেড, প্যারিস-এর জনগণ, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।
e-mail : srchakraborty@gmail.com

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও স্মৃতিকথায় সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুবন্ধ

দেবব্রত ঘোষ*

(প্রাপ্ত : ১৬ জুন ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

একটি বিষয়ের সঙ্গে অপর এক বা একাধিক বিষয়ের পরিকল্পিত বা স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ স্থাপনকে বলে অনুবন্ধ। বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম আলো* ও *অর্ধেক জীবন*-এ সাহিত্য ও ইতিহাসের কী ধরনের অনুবন্ধ স্থাপিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। পরিশেষে দেখা যায়, ইতিহাস ও উপন্যাসের (বা সাহিতের) বৈসাদৃশমূলক সাধারণ ধর্মের মধ্যে লেখক যেহেতু মোটামুটি ভারসাম্য সফলভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন, সেহেতু প্রথমোক্ত তিনটি উপন্যাসই সার্থকনামা ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে। এগুলিকে তাই ইতিহাসের পঠন-পাঠনে সমধর্মী পুস্তকপাঠের কাজে সহজেই লাগানো যেতে পারে। আবার *অর্ধেক জীবন*-এর মতো স্মৃতিকথাও বিশেষ বিশেষ সময় ও ঘটনাপ্রবাহকে সম্যক্ বোঝার ক্ষেত্রে প্রথাগত ইতিহাসের সম্পূরক হয়ে উঠতে পারে।

সূচকশব্দ

উপন্যাস, স্মৃতিকথা, সাহিত্য, ইতিহাস, অনুবন্ধ, নবজাগরণ, কলকাতা, সমধর্মী পুস্তকপাঠ।

আমরা জানি যে, একটি বিষয়ের (topic বা subject) সঙ্গে অপর একটি বা একাধিক বিষয়ের পরিকল্পিত বা স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ স্থাপনকে অনুবন্ধ (correlation) বলে।[১] এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪—২৩ অক্টোবর ২০১২) উপন্যাসে ইতিহাস ও সাহিত্যের যে ধরনের অনুবন্ধ স্থাপিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রে মূলত বিবেচ্য তাঁর রচিত চারটি উপন্যাস বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, তিনটি উপন্যাস ও একটি আত্মজীবনাত্মক স্মৃতিকথা : *সেই সময়* (প্রথম খণ্ডের

*অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়, উখরিদ, খণ্ডঘোষ।
e-mail : debabrata_61@radiffmail.com

প্রবন্ধ

কয়েকটি রাজকীয় পরিবার ও ক্রিকেট

সুমিত গাঙ্গুলী*

(প্রাপ্ত : ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি.; মনোনীত : ৩ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পেত ক্রিকেট। একসময় (এবং পরেও) মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথায় পরিচালিত এই রাজবংশগুলি জাঁকজমক, আদব-কায়দা, খুন-ষড়যন্ত্র নিয়ে দিন কাটাত। এরকমই এক পরিবারে জন্ম হয় মহারাজা রঞ্জিৎ সিং-এর। যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের একজন এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহু দেশীয় রাজ্যের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের ক্রিকেট খেলায় মূল পরিকাঠামো তৈরি হয়।

সেই ঘাত-প্রতিঘাত, খুন-ষড়যন্ত্রের পরিবারের ৪ বা ৫ প্রজন্ম ধরে ক্রিকেটীয় পরিবারে উত্তরণের ইতিহাস, তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা, ক্রিকেটের অবস্থা তথা বিভিন্ন রাজ পরিবার থেকে প্রায় ১১জন টেস্ট ক্রিকেটার ও ৫০জনের মতো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এরই সমান্তরালে ভারতে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের সূত্রপাত থেকে ইংল্যান্ড সফর, প্রথম টেস্ট খেলা, টেস্ট জয়, বিশ্বকাপ জয়, এবং বেটিং বিতর্ক অবধি কালসীমা ধরে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ

জারেজ, জাদেজা, দেশীয় রাজ্য, ক্রিকেট, ভারতীয় ক্রিকেট, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, টেস্ট ক্রিকেট, রণজি ট্রফি, রণজিৎ সিং, দলীপ সিং, নবনগর, রাজকোট, বরোদা, জামসাহেব, দুঙ্গারপুর, পাতৌদি, কোচবিহার।

*ইউ. জি. সি. রিসার্চ ফেলো, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চর্চা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : sumitganguly14@gmail.com

প্রবন্ধ

বর্ধমান জেলায় নারী আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা (১৯৪২-৫২)

কাকলি মুখার্জী*

(প্রাপ্ত : ১২ মে ২০১৩ খ্রি.; সংশোধিত : ১৭ জুন ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের জাপান, বিরোধী নীতির প্রতিক্রিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। মানুষের চরম সঙ্কটের প্রতিরোধে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটি মহিলাদের সংগঠিত করে জনযুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় নারী সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবাদের বিরোধে ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে মানুষের অধিকার রক্ষায় গড়ে ওঠে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। ক্রমশ সারা বাংলা জুড়ে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে বর্ধমান জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে প্রথম জেলার মেয়েরা নারী আন্দোলনে সামিল হন, যা ছিল প্রায় বিপ্লব। জেলা ফুড কমিটি পরে জেলায় বন্যা সাপেক্ষে বন্যা ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে একেবারে সাধারণ নারীদের মধ্যে তাদের কাজ শুরু করে। ক্রমশ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অগ্রণী মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে ও সি. পি. আই. জেলা কমিটির সহযোগিতায় শহর থেকে গ্রামের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের নারীরা সমিতির সদস্য হন। যার ফলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সূচিত হওয়া এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি, যুদ্ধের কারণ ঔপনিবেশিক শাসন, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদের বিষয়ে অবগত হন। এই দুর্ভিক্ষ বাংলায় তথা বর্ধমানে দরিদ্র মেয়েদের জীবনে আর্থিক সঙ্কটের সাথে যে সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে এসেছিল সেই ক্ষেত্রে কৃষকসভার হাটগোবিন্দপুরের সম্মেলনে তাদের পুনর্বাসনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তা মহিলা সমিতির গণভিত্তিকে প্রসারিত করে।

সূচকশব্দ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বর্ধমান জেলা ফুড কমিটি, বর্ধমান বন্যা রিলিফ কমিটি, জেলা কৃষকসভা, নারী আন্দোলন, শ্রেণি আন্দোলন, গণ আন্দোলন।

---

*এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি।

e-mail : kakalimukherjee76@gmail.com

প্রবন্ধ

প্রান্তিকের প্রান্তিক : আদিবাসী নারী ও প্রচলিত অতিকথন (মিথ)

দেবশ্রী দে*

(প্রাপ্ত : ১০ জুন ২০১৩ খ্রি.; সংশোধিত : ১৯ জুন ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আধুনিক ভারতের প্রগতিশীল অর্থনীতি ও বর্ণময় রাজনীতির পশ্চাতে কোথাও যেন তার দেশীয় জনগোষ্ঠী কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ও প্রান্ত থেকে বিলুপ্তির অন্ধকারে চলে যেতে বসেছে। প্রতি নিয়তই তাদের নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবুও এরা দমে যায়নি, লড়াই করে চলেছে। কারণ সংগ্রামী প্রকৃতি ব্যতীত আদিবাসী মানুষকে চিন্তাই করা যায় না। এই সমাজের নারীজাতির ওপর এযাবৎ খুব কমই আলোকপাত করা হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমী, অদম্য সাহসী, সংগ্রামী এই আদিবাসী রমণীই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক নতুন ভাষা সংযোগ করেছে আদিবাসী নারী। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তা ক্রমে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সূচকশব্দ

আদিবাসী, নারী, নৃতত্ত্ব, পিতৃতন্ত্র, আন্দোলন।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বিশ্ব ইতিহাসে নারীর পরাজয়কে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থান ও তার ফলস্বরূপ পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা হারানোর সাথে চিহ্নিত করেছেন।[১] মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্থ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানা বা উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন প্রণালীর মালিকানা নয়, বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে জমি, যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে কীভাবে অপর ব্যক্তির শ্রমকে আত্মসাৎ করবে সেই কৌশল বা দক্ষতাকেও বোঝায়। কাজেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থান আর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যাওয়া— দুটি প্রক্রিয়াই এক অর্থে সমার্থক। আবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের শ্রেণি-শাসন অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন। এঙ্গেলস মার্কসকে অনুসরণ করে ও মর্গ্যানের নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ওপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উত্থান

---

*ইউ. জি. সি. রিসার্চ ফেলো (সিনিয়র), ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : debasreede16@gmail.com

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত : ২৫ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.)

অনুশীলন সমিতির কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ছিল না। তাই 'অনুশীলন সমিতি শতবর্ষ উদযাপন কমিটি' এক অবিস্মরণীয় সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ প্রমাণপত্র রক্ষার জন্য এই পুস্তকটি প্রকাশ করেছেন। সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক অমলেন্দু দে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকে এই দলের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভারতে ও ভারতের বাইরে এই দলের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের এই ধারাটি ইতিহাস আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসের ধারাগুলিকে এইভাবে বিভক্ত করা যায় : ১৮৭৫-১৯১০, ১৯১১-১৯১৯, ১৯২০-২৩, ১৯২৪-১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত। অনুশীলন সমিতির তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ইংল্যান্ড থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করে ভারতে এসে ১৮৯৩ সালে তিনি যে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের মডেল তৈরি করেন, তাতেই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালে অরবিন্দ স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯১০ থেকে তিনি রাজনীতি ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর ভাবশিষ্যরা এই সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বসু ও রাসবিহারী বসু সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাটির প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন।

সম্পাদকের কথা থেকে কিছু কিছু কথা নিয়ে বলা যায়, ১৯০২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই দলের অস্তিত্ব ছিল। এই দলের একাংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে ও অপরাংশ আর. এস. পি.-তে যোগদান করেন। অনুশীলন সমিতির ধারবাহিক ইতিহাস না থাকাতে সম্পাদক এই পুস্তকটির সম্পাদনার ভার নিয়েছেন।

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া।
e-mail : bisk707@gmail.com

গ্রন্থ সমালোচনা

আমজনতার জন্য বাংলার রাজনীতির ইতিহাস

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত : ২৭ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রি.)

রাজনীতি শব্দটি আজকাল অনেক সময়ই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। কোনও বিষয় নিয়ে গোলমাল বা বাদ-বিসম্বাদ হলে বলা হয় 'বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে'। ফলে রাজনীতির প্রকৃত অর্থ আজকের সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্যে যেন অনেকাংশই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক থেকে চোখ ফেরানো যাক অতীতে। ইতিহাসচর্চার বিষয় হিসেবে একটা সময় মুখ্য ছিল রাজ-রাজড়ার ইতিহাস। রাজতন্ত্রের অবসানে রাজনৈতিক ইতিহাস আর শুধু রাজপরিবার আর তার সভাসদ-আমীর-ওমরাহদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ফলে রাজার বদলে তা হয়ে উঠল নতুন শাসকের ইতিহাস। শাসকের ইতিহাস মানে ব্যক্তি-শাসকের কীর্তিকাহিনির বিবরণ নয়, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল শাসকের সঙ্গে শাসিতের নানান টানাপোড়েনও। ইতিহাসের স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইতে এই রাজনৈতিক ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়। তাতে একটা সামগ্রিক ছবি হয়তো ফুটে ওঠে। কিন্তু এই সামগ্রিক 'বড়' ইতিহাসের বাইরে থেকে যায় কিছু 'ছোট' ইতিহাসও। পাঠ্যবই এই সব বিষয়ের প্রতি সুবিচার করে না। প্রয়োজন হয়ে পড়ে আরও গবেষণার।

অবশ্য ব্যাপারটা এমন নয় যে 'বড়' ইতিহাস নিয়ে গভীর গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। বরং বলা চলে, একেবারে সহজ কথায় গবেষণার মূলত দুটি প্রকারভেদ— (এক) নতুন তথ্যের অন্বেষণ আর (দুই) জ্ঞাত তথ্যের নতুন বিশ্লেষণ। সেই হিসেবে বড়ো বা ছোটো অর্থাৎ জাতীয় বা স্থানীয় উভয় ইতিহাসই ফিরে দেখা যায়। ফিরে ফিরে দেখতে হয় নতুন বিশ্লেষণের জন্য। আর এই নতুন বিশ্লেষণের সুযোগ ঘটে কোনও ঐতিহাসিক

---

*এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।
e-mail : sabya4@klyauniv.ac.in